বুড়ো হাজরা কথা কয়

(গল্পগ্রন্থ – রূপহলুদ)

সকালবেলা পাঁচুদাসী বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল।

সারাদিন নৌকো বেয়েছে মাঝি, সন্ধ্যায় বনগাঁ ইস্টিশানে এসে পৌঁছোয়। কতদূরে যেতে হবে তা সে জানতো না।কত জলকচুরির দামের ওপর পানকৌড়ি বসে থাকা, ঝিরঝিরে-হাওয়ায়-দোলা বাঁশবনের তলা দিয়ে দিয়ে নৌকো বেয়ে আসা; জলকচুরির নীল ফুলের শোভায় গলুসি-বদ্দিপুরের চর আলো করে রেখেছে; কত বন্যেবুড়োর গাছে গাছে ঠাণ্ডা নদীজলের আমেজে বকের দল, পানকৌড়ির দল বসে ঠিক যেন ঝিমুচ্চে।

পাঁচুদাসীর স্বামী উদ্ধব দাস বেশ জোয়ান-মর্দ লোক। বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই ওর—শক্ত হাত-পা, এই লম্বা এই চওড়া বুক, এই হাতের গুলি, এই বাবরি চুল। জাতে কাপালী, বন-জঙ্গল উড়িয়ে তরিতরকারির আবাদ করে সোনা ফলায়। দক্ষিণ অঞ্চল থেকে ওরা এসে এখানে বাস করচে আজকাল সেই সব গাঁয়ে, যেখানে দশ বছর আগেও ছিল কাঁটাবন, ঝোঁপ-জঙ্গল। যা-হোক দু'পয়সা রোজগারও করে, বিশেষ করে আজকাল যুদ্ধের দরুন তরিতরকারির যা দাম।

উদ্ধব বল্লে স্ত্রীকে—চিঁড়ে কতগুলো আনলি?

পাঁচুদাসী বেশ শক্ত-সমর্থ মেয়েমানুষ। একহারা, লম্বা, শ্যামল, উনিশ-কুড়ি বয়েস, মুখের ভাবে বেশ একটা কাঁচা লাবণ্য মাখানো—অথচ একা সংসারের সব কাজ মুখ বুজে করে যাবে, চার-পাঁচটা হালের গরুর ডাবায় জল তুলবে কুয়ো থেকে, বাইরের বড় গোয়াল পরিষ্কার করবে, দশ গণ্ডা বিচালির আঁটি কাটবে—তারপরে আবার রান্নাবাড়া করবে—স্বামীর মাঠের পান্তাভাত, গরম-ভাত, জনমজুরের ভাত—এসো, জন, বসো-জন, গেরস্থর সবই তো থাকে।রাতদুপুরে লোক-কুটুম্ব এলে পাকি আড়াই-সেরা কাঠার এক কাঠা ডবল-নাগরা চালের ভাত বড় তোলো হাঁড়িটায় চড়িয়ে দেয় এক নিমেষে। দেখতে নরম-সরম হলেও লোহার মত শক্ত হাত-পা।

পাঁচুদাসী একটা ছোট থলে নৌকোর খোল থেকে টেনে বার করে হাতে আন্দাজ করে বললে—কাঠা দুই—

—ওতেই হবে?

—আমি তো উপোস। শুধু তুমি আর মাঝি ছোঁড়া খাবে—

—তেঁতুল এনেছিস্ তো?

—হুঁ-উ-উ।

স্বামীর দিকে বঙ্কিম—কটাক্ষে চেয়ে বলে—যত পারো—

তারপর আবার নৌকো চললো উলুটি বাড়োর কিনারায় কিনারায়, নদীর ঠাণ্ডা শ্যামল জলধারা যেখানে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেচে ভাঁটার টানে সাতভেয়েতলার বড় বটগাছের দিকে। উদ্ধব দাস তামাক খাবার জন্যে চকমকি ঠুকচে, মাঝিকে বলচে—ইদিকি এবার বাগুনের বীজপাতা দেওয়া হয়নি দেখচি—হ্যাঁরে, এ ক্ষেতটা কি জেড়ো কুমড়োর?

মাঝি বল্লে—জেড়ো কুমড়ো না হলে কি অত বড়ডা হয়—দ্যাখচো না?

—চত্তির মাসের শেষ—এখনো ক্ষেতে শীতের কুমড়ো কাটেনি—কেমনধারা চাষা এরা? .... তামুক খাবা?

মাঝি ছোঁড়া ঘাড় নেড়ে বল্লে—খাইনে।

—তোর দাদা মনিন্দর তো খায়।

—খায় না! বলে হুঁকো শোষে! দাদা খায় বলে কি আমাকেও খেতে হবে?

—না তাই বলছি।

—কি চর এডা? আর কদ্দূর?

—চর পোলতা। আর দু'খানা বাঁক।

—বাঁকের মুড়োয়, না বাঁকের মাজায় ?

—এক্কেবারে ও মুড়োয়—

—তাহলে এখনো দেড় ঘণ্টা দু ঘণ্টা—

পাঁচুদাসী দেখতে দেখতে যাচ্ছে, বেশ ভাল লাগছে ওর।বাড়ি থেকে কত দিন একটু বেরুনো হয়নি, শুধুই গোয়াল পরিষ্কার, ক্ষার কাচা, বাসন মাজা, তোলো তোলো ধানসিদ্ধ, গরুর ডাবায় জল তোলা....এ যেন মুক্ত দিনের লীলায়িত অবকাশ! দিন-শেষের হলদে রোদে আকাশ কেমনতর হয়ে উঠচে, নৌকোর গলুইয়ে চলমান নদীর ছলছল রাগিণীর ছন্দ বাজচে, গলা-লম্বা কি পাখি শেওলার মধ্যে জেলেদের পাতা তেঁতুল ডালের হুড়ির ওপর বসে নৌকোর দিকে চেয়ে আছে, নলখাগড়ার বনের গত শীতকালের তিতপল্লার ফল শুকিয়ে শুকিয়ে ঝুলচে, ভুস ভুস করে শুশুক ডুবচে উঠচে জলে নৌকোর এপাশে ওপাশে।

—হাঁগো, ওগুলো কি, শুশুক না কচ্ছপ?

—শুশোক—

—আহা-হা, শুশোক বুঝি?—শুশুক তো বলে। বাঙাল কোথাকার!

পাঁচুদাসী নাগরিকতার আভিজাত্যে ঘাড় বেঁকিয়ে হাসির ঝিলিক দিয়ে স্বামীর দিকে চায়।

—নাও, নাও, ওই হল, শুশুকই হল—

—খিদে পেয়েচে?

—পাইনি? সে তুই বুঝচিস নে? তোকে বলতে হবে?

ঠিক ঠিক। পাঁচুদাসীর ভুল হয়ে গিয়েচে। ওর বড় খিদে, জোয়ান মরদ পুরুষ, ভূতের মতখাটে দিন-রাত, মাটির সঙ্গে কাজকারবার। একটি কাঠা তার নাম। চিঁড়ে আর তেঁতুল আর লবণ আর আখের গুড়। এক নিঃশ্বাসে কাবার করবে। ওর খাওয়া একটা দেখবার মত জিনিস বটে।

বালাই ষাট, চোখ দিতে নেই!

—আঙট পাতায় দেবো তো!

—ভিজিয়েচ?

—না, এই গামছায় বেঁধে দিচ্চি—নৌকো থেকে জলে ডুবিয়ে খানিকটা বসে থাকো। বাঁশমলা ধানের চিঁড়ে, এখুনি ভিজে কাদা হয়ে যাবে। ওই মাঝি ছোঁড়াকেও দিই ওই সঙ্গে—তাকেও বলো—

চর পোলতা ছাড়িয়ে দু'ধারে বনজঙ্গল, ঘাটবাঁওড়ের চর। ওরা একমনে খেয়ে যাচ্চে, মাঝি নৌকো বেঁধেছে একটা ষাঁড়া ঝোপের কোলে। বড় কুবো পাখি পাখা ঝট্‌পট্ করচে আলোকলতার জালের আর কুঁচকাটার জটিল ডালপালার নিবিড়তায়। কাল রাতের সে স্বপ্নটার কথা মনে পড়ায় পাঁচুদাসীর সারা গা আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো।

আর ঠিক কি কাল রাতেই!

যে ভোরবেলা নৌকো ছাড়বে মিশেনখালি যাবার জন্যে, ঠিক তার আগের রাতেই।

সারা গা যেন শিউরে উঠে আনন্দে ও বিস্ময়ে।

স্বপ্ন দেখলে সে যেন তাদের বাড়ির উত্তরদিকে যে কলুদীঘি আছে, তার উঁচু পাড়ে বড় ঘোড়া-নিমগাছটার তলায় অকারণ দাঁড়িয়ে আছে। ঘেঁটু ফুল ফুটে আলো করেছে দীঘির পাড়, এখন চৈত্র মাসে তার মাঝে মাঝে কালো শুঁটি ধরেছে—সেখানটাতে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এমন সময়ে একটি ছোট্ট ছেলে বনের দিকের কোথা থেকে যেন এল। ওর হাঁটু ধরে দাঁড়ালো, ওর মুখের দিকে চাইলো—ওর হাতে একটা পাকা বেগুন ঝোলানো,

তাদের ক্ষেতে বীজপাতা দেওয়ার জন্যে যেমন বেগুন টাঙানো থাকে বাইরের চণ্ডীমণ্ডপের আড়ায়। বল্লে—তোর কাছেআমি আসবো মা!

পাঁচুদাসীর নিঃসন্তান বুভুক্ষু প্রাণ বলে উঠলো—আসবি খোকা? আসবি? তোর হাতে ওকি?

—বাগুন। তোদের ক্ষেতে নিড়েন পাট করে পুঁতে দেবানি—

—ওরে আমার সোনা! ক'নে ছিলে এমন মানিক? আয় আয়—

কি চমৎকার মুখখানা খোকার! ওই ছিরু ঘোষের মেজ নাতির মত দেখতে। পাঁচুদাসীর বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো স্বপ্নের কথা ভেবে। কোথায় হারিয়ে গেল সে মুখ! স্পষ্ট মুখখানা মনে পড়ে এখনো।চোখে জল এসে পড়ে পাঁচুদাসীর।

সত্যি যেন এ স্বপ্ন! সত্যি হবে?

আজই বিশেষ করে ও-স্বপ্ন কেন?

আজ পাঁচটি বছর বিয়ে হয়েছে, একটি ছেলে নেই, মেয়ে নেই। নিঃসন্তান দাম্পত্য সংসারের আকাশে বাতাসে আড়ালে অবকাশে নিষ্ঠুর কালো ছায়া ফেলে থমথমিয়ে থাকে, অথচ অভাব তো নেই সংসারে। গোলাভরা ধান, ডোলভরা মুসুরি, ছোলা, ক্ষেতপোরা বেগুন, কুমড়ো, ঢেঁড়শের চারা ঠেলে উঠেছে কানিজোলের ক্ষেতে। গত শীতকালে সাতগণ্ডা ভাঁড় খেজুরগুড়ে ভর্তি করে আড়ায় তুলে রেখেছে বর্ষাদিনের জন্যে। হাট্‌রা হাট চার-পাঁচ টাকা শুধু বেগুন কুমড়ো বিক্রি। লাউ কী মাচায়! যেমন তেজালো লতা, তেমনি তার ফলন। সূর্যমুখী লঙ্কা খেতে দু'দিকে মুখ করে যেন চোদ্দ পিদিম জ্বালিয়ে রেখেছিল মাঘের শেষেও।

উদ্ধব দাস খাওয়া শেষ করে থালা ধুয়ে ফেল্লে নদীর জলে। মাঝি ছাড়লে ডিঙি। পশ্চিমআকাশে মেঘ জমে আসচে, কালবোশেখীর দিন, উদ্ধব বল্লে—ও মাঝি, হাত চালিয়ে নাও—ওই দ্যাখো—

মাঝি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ঈশান কোণের আকাশে চেয়ে বল্লে—তাতমেঘা! জল হবে না।

—তোকে বলেচে!

—দেখে নিও মোড়ল। তাতের মেঘ, বাতাস উঠতি পারে, জল হবে না।

—বাতাস উঠলেও তো মুশকিল।হাত চালিয়ে নাও—এবার কখানা বাঁক?

—আর একখানা। ওই পাইকপাড়ার বটগাছ থেকে শুরু হল বাঁকখানা। ওর ও মুড়োয়—

পাঁচুদাসীর মজা লাগে ওদের কথাবার্তা শুনতে।

বাড়ি থেকে বেরুলে দুশো রগড়। আজ চরের কাশবনে চড়ুইভাতি চাঁদের আলোর তলায়। বাঁশের চোঙে ফুঁ পেড়ে ধোঁয়াভরা রান্নাঘরে ভাত রান্না নয়। কি বিশ্রী এবারকার তেত্তি বীজ গাছের চ্যালাগুলো।আগুন ধরতে কি চায়। ফুঁ পেড়ে পেড়ে চোখ রাঙা হয়ে যায় একেবারে। সেই ছোট্ট খোকা যেন ওই চরে কাশের ডগায় ডগায় ফড়িং প্রজাপতি ধরে বেড়াচ্ছে। তাকেই ও দেখচে সর্বত্র। সব সময়ই তার কথা মনে পড়চে।

স্বপ্ন কি সত্যি হয় ?

যদি সত্যি হয়! কে বলতে পারে?

ওর সারা গা আবার যেন শিউরে ওঠে।

সন্ধ্যার আর দেরি নেই। ওই দূরে বাঁ-দিকের পাড়ে একটা ইটের পাঁজা। অন্যদিকে হলদে রঙের কোঠাবাড়ি একটা। বড় বড় গাছের তলায় আরও দু'একটা বাড়ি চোখে পড়ে। পাঁচুদাসী জিগ্যেস করলে—হ্যাঁগা, ওই বাড়িটা কাদের? ভালো বাড়ি।

মাঝি বল্লে—ওটারে বলে ডাক-বাংলা। সাহেবরা এসি থাকে।

উদ্ধব দাস বল্লে—সেবার বাগুন বিক্রি করতি এসে দেখি ওর বারান্দায় গোরা সাহেব পিলপিল করচে। এই সঙ্গে মটোর গাড়ি দাঁড়িয়ে। ভিড় কি! সাহেবের ছেলেরা ছুটোছুটি করচেইদিকি ওদিকি।

পাঁচুদাসী কি ভেবে বল্লে হ্যাঁগা, সাহেবদের ছেলেরা দেখতি কেমন?

—খুব ফরসা।

—কেমনধারা ফরসা।

—সে কি বোঝাবো তোরে। তুই পাড়াগেঁয়ে ভূত, সাহেবের কি বুঝিস্?

—আহা-হা! আর উনি একেবারে শহুরে বাবু! সেই একবার বাগুন বেচতি তো এসিছিলে—বলে জন্মের মধ্যি কম্ম, চত্তির মাসে রাস!

ওরা ডাঙায় জিনিসপত্র নামালো।হেঁটে যেতে হবে ইস্টিশানে—আধকোশটাক ডাকবাংলার ঘাট থেকে। একটা ভারি বোঁচকা, এক বোঝা ডাঁটা আর কুমড়ো শাক এই সঙ্গে। পাঁচুদাসী বোঁচকা কাঁখে পেছনে পেছনে চললো—আগে আগে উদ্ধব দাস। মাঝি রইল ঘাটেই, ঝালতলায় সে রেঁধে-বেড়ে খাবে, নৌকোতে শুয়ে থাকবে রাত্রে—আবার কাল রাত দশটার সময় ওরা ফিরবে, নৌকো ছাড়া হবে তখন।

উদ্ধব দাস বল্লে—তোমার কি কি লাগবে বল, কিনে দিয়ে যাই—

—হাঁড়ি একটি, সরা একটি,—আর খলি মাছ যদি বাজারে পাই, মাছের দামটা দিয়ে যাও।

—মুসুরি ডাল খাবা। এক সের ডাল দিইচি আবার মাছের পয়সা;ভারি বড়নোক দেখেচো মোরে!

মাঝি অনুনয়ের সুরে বলেলে—দিয়ে যাও মোড়ল। আমাদের ওদিকি খয়রা মাছ খেতি পাইনে। যদি কাল বাজারে খয়রা মাছ পাই—চার আনা দ্যাও।

পাঁচুদাসী স্বামীকে ধমক দিয়ে বল্লে—দ্যাও না গো ওকে। ছেলেমানুষ। যাচ্ছি একটা শুভ কম্মে। যা খেতি চায় ওর প্রাণ, দাও ওকে। চারগণ্ডা পয়সা দাও মাছের আর দু-আনা দাও রসগোল্লার—

উদ্ধব দাসকে অগত্যা নগদ ছ'আনা পয়সা দিতে হল মাঝির হাতে। মেয়েমানুষের নাই পেলে কি আর রক্ষে রাখে লোক? যাকগে।

কখন গাড়ি আসে নাভারনের ওরা কিছুই জানে না। স্টেশনে গিয়ে জিগ্যেস করে জানা গেল, নাভারনের গাড়ি আসবে কাল ভোরবেলা। কেউ জানে না সেকথা। পাঁচুদাসী স্বামীকে বকলে, না জেনেশুনে আসো কেন? নৌকোতে রাত কাটালে দিব্যি হত। এখানে কি শোবার জায়গা আছে? এত ভিড়, এত লোকের চিৎকার—মাগো, ইস্টিশান নয়—যেন কুঁদিপুরের গাজনতলায় আড়ং বসেচে!

উদ্ধব দাস অভিজ্ঞতার অটুট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বল্লে—তুই থাম দিকি? তুই চিনিচিস্ কেবল কুঁদিপুরের গাজনতলার আড়ং—দেখলি বা কি জীবনে?

— তুমি খুব দেখেচো তো! তা হলেই হল—

—তোর চেয়ে তো বেশি। আমি আসিনি বনগাঁ ইস্টিশান? শেয়ালদ' গিইচি আলু-পটলের আড়তে। এই রেলে চড়ে যেতি হয়। সাড়ে চোদ্দ আনা ভাড়া।এই দিকি—

উদ্ধব দাস আঙুল দিয়ে কোলকাতা লাইনের ডিসট্যান্ট সিগন্যালটা দেখালে।

উদ্ধব দাস জিগ্যেস করে একজন কুলিকে—বলি শোনো, একটু ভালো জল পাওয়া যায় ক'নে?

কুলী আধা বাংলা আধা হিন্দিতে যা বলে গেল তার অর্থ এই—ভালো জল আমি পাব কোথায়? নিজে খুঁজে দ্যাখো!

একজন ওদের বলে দিলে, ওভারব্রিজের ওপর বিছানা করে শুতে। ওখানে হাওয়া আছে, মশা লাগবে না, প্ল্যাটফর্মে বেজায় মশা।

ওরা তাই করলে বটে, কিন্তু রাতে পাঁচুদাসীর মোটে ঘুম হল না। হৈ-চৈ চিৎকার, রেলগাড়ি আসচে সারারাত ধরে। কত কষ্টে ভোর হল। রাত আর পোহায় না।

ঘুমজড়িত কণ্ঠে পাঁচুদাসী বল্লে— হ্যাঁগো, ওই চা কি লোকের খাবার সময় অসময় নেই গা? সারারাতই চা গরম! লোকে ঘুমুবে না চা খাবে? চক্ষেও কি ওদের ঘুম নেই? এমন অনাছিষ্টি কাণ্ডও যদি কখনো দেখে থাকি!

ভোরে নাভারনের ট্রেন এল। লোকজন সব উঠলো। ওরাও উঠল। আবার সেই ছোট খোকার মুখ মনে পড়লো পাঁচুদাসীর। সেই ছোট্ট সুন্দর মুখখানি, সম্মুখের এক অজানা দিনের কোণ থেকে উঁকি মারচে, কিসের আড়াল ওদের দুজনের মাঝখানে! হাজরাতলার বুড়ো হাজরা ঠাকুর কি সে আড়াল দূর করতে পারবেন?

নাভারন ছোট্ট ইস্টিশান।

সামনের চওড়া পাকা রাস্তা গিয়ে ওধারের বড় রাস্তায় মিশেছে। বড় বিলিতি চটকাগাছের সারি পথের দুধারে। পাঁচুদাসী বল্লে—ও রাস্তা কোথাকার গো?

উদ্ধব দাস জানে না। বল্লে—কি জানি? বলতে পারিনে।

একজন গাড়োয়ান ধানের বস্তা নামাচ্ছিল গরুর গাড়ি থেকে, সে বল্লে—ওই রাস্তা? ও গিয়েছে যশোরে, ইদিকে কলকাতায়। ওর নাম যশোর রোড।

যশোর রোড! যশোর রোড! পাঁচুদাসীর মুখে হাসি এসে পড়ে অকারণে! কি নাম যে বাপু!

উদ্ধব দাস সেই গাড়ির গাড়োয়ানকে বললে—নিশেনখালিন হাজরাতলায় নিয়ে যাবা?

—তা যেতি পারি। কজন?

—দুজন। এই তো দেখতে পাচ্চ।

—আজ পরবের দিন, সেখানে বড্ড ভিড় হয়, কত দেশ থেকে হাজরাতলায় পুজো দিতি লোক আসে। পাঁচটি টাকা ভাড়া লাগবেক যাতায়াতে।

এমন সময় পাঁচুদাসী লক্ষ্য করলে দামী শাড়ি পরনে একটি সুন্দরী বৌ স্টেশনের বাইরে জামতলাটায় ওদের কাছে এসে দাঁড়ালো।ওর সঙ্গে একটি ফরসা জামাকাপড়পড়া ভদ্রলোক, চোখে চশমা, হাতে ঘড়ি। পেছনে পেছনে একটা চাকর গোছের লোক, তার হাতে চামড়ার একটি বাক্স। বৌটি তাকে বল্ল তুমি কোথায় যাবে?

পাঁচুদাসী সঙ্কোচের সুরে তাকে বল্লে—নিশেনখালির হাজরাতলায়—

বৌটি পেছন ফিরে তার সঙ্গী ভদ্রলোককে বল্লে—ওগো, এরাও সেখানে যাচ্ছে—

ভদ্রলোকটি উদ্ধব দাসকে বল্লে—তোমরাও হাজরাতলায় যাবে?

—হ্যাঁ বাবু। আপনারাও সেখানে যাবেন?

—আমরাও সেখানে যাচ্চি। কত দূর?

—তা তো বাবু জানিনে।আমরা নতুন যাচ্চি। আজ মঙ্গলবার, সেখানে আজ পুজো দিতে হয়, তাই যাবো।আমাদের বাড়ি অনেকদূর এখান থে।

—তাই তো! এ যে অজ পাড়াগাঁ দেখছি। কোথায় কতদূর যেতে হবে না জানলে এখন করি কি—

—বাবু, এই গরুরগাড়ি সেখানে যাবে বলছে। পাঁচ টাকা ভাড়া। চলেন ওই গাড়িতেই সবাই যাই। আপনারা এখন গাড়ি পাবেনই বা কঁনে, মাঠাকরুন না হয় গাড়িতে উঠুন, আমি হেঁটে যাবো এখন।

বেলা বারোটার সময় ওরা একটা আধমজা নদীর ধারে এসে হাজির হল।নদীর নাম ব্যাং নদী—দুধারে বনজাম আর হিজল বাদামের বন, বাঁশনি বাঁশের বন আর বেতঝোপ। অত বেলা হলেও রোদ নেই এপারে, দিব্যি ঘন ছায়া। গাড়োয়ানের মুখে শোনা গেল নদী পার হয়ে আধক্রোশটাক গেলেই নিশেনখালির হাজরাতলা।

ইতিমধ্যে বৌটির সঙ্গে পরিচয় হয়ে গিয়েছে পাঁচুদাসীর। ওর নামটি বড় কটোমটো, মুখ দিয়ে উচ্চারণ হওয়া কঠিন—ম-ন-জু-লা।কলকাতায় শ্বশুরবাড়ি, সঙ্গে যিনি এসেছেন উনিই স্বামী, কলকাতায় চাকুরি করেন। পয়সাওয়ালা লোক, কলকাতায় নিজেদের বাড়ি আছে। বিয়ে হয়েছে আজ চার বছর, ছেলেপুলে না হওয়াতে হাজরাতলায় পুজো দিতে চলেছে ওদেরইমত।

ম-ন-জু-লা বলছে—আচ্ছা ভাই, ঠাকুর খুব জাগ্রত, না?

—শুনেছি তো দিদি। আমারও তো সেইজন্যিই আসা। যদি উনি মুখ তুলি চান—

—আমারও তাই। তোমায় বলতে কি, সব আছে কিন্তু মনে সুখ নেই। উনি আবার এসব মানেন না, আমি জোর করে নিয়ে এসেছি। বলি চলো, পাঁচ জায়গায় দেখতে হয়—এতে আর কষ্ট কি? আমার তো দিব্যি লাগছে ভাই। কি চমৎকার নদীর ধারটা—কলকাতা থেকে কতকাল কোথাও বার হইনি ভাই—মধুপুর যাওয়া হয়েছিল সেবার পুজোয়—দু'বছর হল—

—সে কোথায় দিদি? মধুপুর?

—পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণায়। পাহাড় আছে, শালবন আছে সেখানে। বেশ ভালোজায়গা কিন্তু এ জায়গাও আমার বেশ ভালো লাগছে—কত পাখির ডাক! পাখির ডাক শুনেযেন বাঁচলাম কত দিন পরে। কেমন সুন্দর, না?

পাঁচুদাসী বৌটির কথাবার্তার ভঙ্গিতে কৌতুক অনুভব করলে। পাখির ডাক শুনে শুনে তার কান পচে গেল। সে আবার কি একটা জিনিস এমন তা তো জানা নেই! যত আজগুবিকাণ্ড! ভদ্রতার খাতিরে সে বল্লে—হ্যাঁ দিদি, ঠিক। চলুন আমার সঙ্গে আমাদের গাঁয়ে ঝিটকিপোতায়। দিনরাত পাখির কিচিরমিচির শোনাবো।

তারপর ওরা ব্যাং নদী জীর্ণ খেয়ায় পার হয়ে ওপারে চলে গেল। আরও কয়েক দলের সঙ্গে দেখা হল—আশপাশের গ্রাম থেকে তারাও চলেছে, আজ মঙ্গলবারে হাজরাতলায় পুজো দিতে। গাড়ি নদীর ওপারেই রয়ে গেল। এ পথটুকু হেঁটেই যেতে হবে। নদীর ধার দিয়ে খানিকটা গিয়ে এক যজ্ঞিডুমুর গাছের তলা দিয়ে বনঝোপের পাশ কাটিয়ে পথ চলেছে উত্তর মুখে—বাবলা গাছে ভর্তি সবুজ মাঠের মাঝখান বেয়ে।

পাঁচুদাসীর বড় আমোদ লাগছিল। কত লোকের সঙ্গে দেখা, কত দেশ-বিদেশ! কলকাতার বৌটিকে ওর বড় ভালো লেগেছে—হোক না কটোমটো নাম, কি ভালো মেয়ে, কি মিষ্টি কথা, অমায়িক ব্যবহার!

আর একটি বৌ এসেছে। ওর নাম তারা, জাতে সদগোপ। বাড়ি বনগাঁর কাছে হরিদাসপুর। তার ছেলে হয়ে মরে যাচ্ছে—গত পৌষ মাসেও একটি ছেলে হয়ে মারা গিয়েছে ওর—সেই ছেলের কথা বলে আর কাঁদে।

ম-ন-জু-লা বোঝাচ্ছে—কেঁদো না ভাই। সব ভগবানের ইচ্ছে। আবার কোলজোড়া খোকা পাবে বই কি—এখন তুমি ছেলেমানুষ—তাঁর নাম করে চলো, কাজ হবে ঠিক। কি বলো ভাই?

ও পাঁচুদাসীর দিকে চেয়ে শেষের প্রশ্নটা করলে। কিন্তু পাঁচুদাসীর মন তখন অনেক দূরে চলে গিয়েছে সেই কলুদীঘির ধারে বড় তুঁততলায়—হাতে পাকা বীজবেগুন, চাঁদমুখখানা ওর দিকে উঁচু করা, কত বিঘের ক্ষেতের বীজ!—দুহাতে ছড়ানো...ও ধন সোনামণি, তুমি আসবা, আসবা আমার কুঁড়েঘরে আমার কোলজোড়া হয়ে! আসবা আঁধার পক্ষের শেষ রাতের অন্ধকারে, পাখিপক্ষী যখন ডেকে উঠবে আমবনে, বাঁশবনে, কুল্লো পাখি

ডাকবে শিমুল গাছের মগডালে, বেলবাওড়ে মাছ ভেসে উঠবে কেউটে পানার দামের মধ্যি! বুড়ো হাজরার দোহাই, পেঁচোপাঁচীর দোহাই...এসো খোকা, এসো....

একজন কে বলচে—আঁচল পাততে হয় হাজরাতলায় —নদীতে নেয়ে আঁচল পেতে ঠাকুরতলায় বসে থাকতে হয়—

পাঁচুদাসী বল্লে—কেন?

—আঁচলে ফল পড়ে, ফুল পড়ে—যার যা হবে তাই পড়ে।

কথা চাপা পড়ে গেল। সবাই বলচে ওই হাজরাতলা দেখা যাচ্ছে—

ওরা পৌঁছে গেল।

নদীর ধারে মাঠের মধ্যে চারিধারে বহু প্রাচীন ষাঁড়া গাছের সারি নিবিড় ঝোপ তৈরি করেচে ওরা জড়াজড়ি করে। বেড়ার মত আড়াল করেচে...ওর ওদিকে কিছু চোখে পড়ে না। সেই ষাঁড়া ঝোপের বেড়ার ধারে একটা বড় ষাঁড়া গাছই হচ্ছে হাজরাতলা, বৃদ্ধ হাজরা ঠাকুরের স্থান।...

সেই গাছতলায় পুজোর যোগাড় হয়েছে...পুরুতঠাকুর বসে আছে। চাল, কলা, ছোলাভিজে, পেঁপে....ফুলের রাশ। লোকে লোকারণ্য হাজরাতলায়। দশ-পনেরোখানা গরুরগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে—এপার থেকে যারা এসেছে তাদের গাড়ি।

ষাঁড়া ঝোপ ঘেরা মাঠের বাইরে দোকান বসেচে....মুড়িমুড়কি, ফুলুরি, কাটিভাজা, ছোলাভাজা। পিঁ-পিঁ বাঁশি বাজচে ছোট ছেলেমেয়েদের মুখে...খেলনা বিক্রি হচ্ছে। মাটির ছোবা, পুতুল, রাধাকেষ্ট, শিবঠাকুর, ঘোড়া—মণিহারি দোকানে ফিতে, কাঁচের চুড়ি, চিরুনি বিক্রি হচ্ছে...দু'তিনখানা দোকানে পাঁপর ভাজা হচ্চে। তেমনি খদ্দেরের ভিড়—বেশির ভাগ ছোট ছেলেমেয়ে আর গরুর গাড়ির গাড়োয়ানেরা। আশপাশের গ্রাম থেকেও অনেক ঝি-বৌ বিনা কারণেই পুজো দেখতে এসেচে হাজরাতলায়।

বেলা দুপুর ঘুরে গিয়েচে। পুজোর বাজনা বেজে উঠলো।

পুরুতঠাকুর বল্লেন—যাও মা-ঠাক্‌রুনরা, স্নান করে এসে ভিজে কাপড়ে সব হাজরাতলায় আঁচল বিছিয়ে বসো—

কলকাতার বৌটি আর পাঁচুদাসী একসঙ্গে নেয়ে উঠলো নদী থেকে। এক নিঃশ্বাসে ডুব দিতে হবে, উত্তরমুখ হয়ে হাজরা ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করতে হবে।

ম-ন-জু-লা চুপি চুপি বল্লে—ভাই, আমার বুক কাঁপচে।

—কেন দিদি?

—আমার বড় সাধ—তোমাকে বলচি ভাই, বুকখানা হুহু করে মাঝে মাঝে। আমার সঙ্গে আমার সমবয়সী যাদের বিয়ে হয়েছিল, সবার একটি দুটি সন্তান হয়ে গিয়েচে—ওঁর মনে বড় কষ্ট—

—বাবার দয়া দিদি। হয়ে যাবে, চলো শীগ্‌গির করে যাই—

পাঁচুদাসীর বড় মায়া হয় বৌটির ওপর। কি চমৎকার মানিয়েছে ওকে নীল রং-এর ফুলতোলা ভিজে শাড়ি পরে...দু'দণ্ড চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। অনেকেই চেয়ে চেয়ে দেখছিলও ওকে...সুন্দরী বটে...পাড়াগাঁয়ের হাটে-মাঠে অমন সুন্দরী মেয়ে চক্ষে পড়ে কখনো? আহা, মোমের গড়ন হাত দুটি কখনো কি গোবরের ঝুড়ি ধরতে পারবে? গড়ে ধান ভেনে দিতে পারবে—আঙুল ছেঁচে যাবে তা হলে। ও-হাত ধান ভেনে দেওয়ার জন্যে তৈরি হয়নি।

অন্তত পঁচিশ-ত্রিশ জন বৌ, সবাই তরুণী, ভিজে কাপড়ে সারি বেঁধে হাজরাতলায় দাঁড়িয়ে। পুরুতঠাকুর সকলের মাথায় কুশিতে করে জলের ছিটে দিয়ে বল্লেন—যাও সব মায়েরা, এইবার আঁচল পেতে বসো গে—

একজন বল্লে—কতক্ষণ বসে থাকবো বাবাঠাকুর?

—চোখ বুজে বসবে সবাই। যতক্ষণ না আঁচলে কিছু পড়ে ততক্ষণ বসবে মা তোমরা। চোখ চেও না কেউ, আসন ছেড়ে উঠে পড়ো না যেন অধৈর্য হয়ে।

চৈত্র মাসের খররোদে মাঠ তেতে উঠেচে—বাতাস যেন আগুনের হলকা, তবুও হাজরাতলায় বেশ ছায়া আছে তাই রক্ষে—পাঁচুদাসীর জলতেষ্টা পেয়েচে, জল খাওয়ার কথা এখন ভাবতে নেই। বুড়ো হাজরা দয়া করুন। ঢোল বাজচে কাঁসি বাজচে। ট্যাং ট্যাং ট্যাং—কাঁইনানা, কাঁইনানা,....না, ও সব ভাবতে নেই...হাজরাঠাকুর অপরাধ যেন না নেন। পাঁচুদাসী আবার মনকে স্থির করবার চেষ্টা করল।

কতক্ষণ কেটে গেল।

পাঁচুদাসী এর মধ্যে বারতিনেক চোখ চেয়ে দেখেচে। আশপাশে হাজরাঠাকুরের কোন মন্দির বা মূর্তি নেই। একটা মস্তবড় ষাঁড়া গাছ অনেকদূর জুড়ে ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তলায় ছড়িয়ে পড়া শুকনো পাতার উপর তরুণী বৌয়ের দল চোখ বুজে আঁচল বিছিয়ে বসে....কোনো লোক নেই এদিকে....পুরুতঠাকুর রয়েচেন দূরে ও গাছের তলায় পুজোর জায়গায়। ও ভাল করে চেয়ে দেখলে গাছতলায় একখানা সিঁদুর মাখানো ইঁট পর্যন্ত নেই।

পাঁচুদাসী আবার চোখ বুজলো।

হঠাৎ ওদের সারিতে একটি বউ অস্পষ্ট স্বরে বলে উঠলো—আমার আঁচলে একটা কি পড়লো!

পাশের একজন উপদেশ দিল—চোখ চেয়ে দ্যাখো না কি?

একটা ষাঁড়া ফল।

বৌটি সারি থেকে উঠে চলে গেল পুরুতঠাকুরের কাছে, যেখানে পুজো হচ্চে। সর্বাঙ্গ শিউরে উঠলো পাঁচুদাসীর এবং সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকও কেঁপে উঠলো। কি জানি ভাগ্যে কিআছে!

আরও দুটি বৌ সারি থেকে উঠে চলে গেল—একজনের ফুল আর একজনের ফল পড়েচে। ইতিমধ্যে আর একজন কেঁদে উঠলে ডুকরে। সবাই বল্লে—কি হল গো, কি হল?

—আমার আঁচলে চুল আর ঢিল পড়েছে গো! পোড়া কপাল গো!

সে কাঁদতে কাঁদতে উঠে চলে গেল সারি থেকে। বুড়ো হাজরা নিষ্ঠুর, দয়া করলেন না তার উপর। কি অপরাধ হল বাবার চরণে! পাঁচুদাসীর বুক কেঁপে ওঠে আবার। বুকের ভেতর যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে। একটা বৌ ঢিপঢিপ করে মাথা কুটছে মাটিতে ওর সারিতে। ওর আঁচলেও তাহলে চুল আর ছাই পড়েছে।

—দয়া করো বাবা হাজরা, বুড়ো হাজরা দয়া করো।

বেলা ঘুরে গিয়েছে। আরও কতক্ষণ কাটলো। হঠাৎ পাঁচুদাসীর বুকের স্পন্দন যেন বন্ধ হবার উপক্রম হল। টপ করে একটা কি পড়লো ওর আঁচলে! ফল? ষাঁড়া ফল? চুল বা ছাই পড়বার শব্দ কি অমন? ঢিল?

....বাবা হাজরাঠাকুর।

সবাই মিলে ব্যাং নদীর খেয়া পার হচ্ছে। উদ্ধব দাস স্ত্রীকে বল্লে—তুই কি পেলি?

পাঁচুদাসী বল্লে—ফল, একটা ষাঁড়া ফল। হাজরাঠাকুরের দয়া গো—

ওর মন ভালো না। ম-ন-জু-লা ফিরে গিয়েছে আগের খেয়ায়। ও পেয়েছিল জট-পাকানোচুলের নুড়ি। পুরুতঠাকুর আর একবার বসতে বলেছিলেন আঁচল পেতে। আবার সেই চুলই পড়েছে তার আঁচলে। পুরুতঠাকুর বলেছেন—মা, আমি কি করবো, আমার ওতে হাত নেই।তোমার অদৃষ্টে সন্তান থাকলে ফুল-ফলই পড়তো—বাড়ি ফিরে যাও মা—কি করবো বলো—

ম-ন-জু-লার কান্না দেখে ওর নিজের চোখে জল এসেছিল। সত্যি, কত আশা করে এসেছিল। হাজরাঠাকুর কি করবেন ? যা অদৃষ্টে আছে তাই তিনি বলে দেবেন মাত্র।বেচারি ম-ন-জু-লা! অত টাকা ওদের!

সূর্য অস্ত যাচ্ছে ব্যাং নদীর পশ্চিম গায়ে বনজাম আর হিজল আর বেত ঝোপের আড়ালে। পাঁচুদাসীর মন আনন্দে ভরে উঠলো হঠাৎ। খোকা আসছে, হাতে তার বীজবেগুন, কত ক্ষেতে ক্ষেতে শক্ত হাতে সে লাঙল দেবে, বেগুনের চারা তুলে পুঁতবে হাপর থেকে, সোনা ফলাবে মাটির বুকে।বুড়া হাজরা বলবার আগে স্বপ্ন দেখেছে তার আসবার। সে আসচে।